৪৬
দৈনিক জনকণ্ঠ
তারিখ ... ২১.২.২০০ ... পৃষ্ঠা ... ২২ ... কলাম ...

বাংলা ভাষায়ও
তথ্য প্রযুক্তি সমন্বয়

বাঙালীর একুশে ফেব্রুয়ারি বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস হলো। নিঃসন্দেহে গৌরব বাড়ল বাঙালীর—বাংলাদেশের— বাংলাভাষার। কিন্তু গৌরবের সঙ্গে সঙ্গে আসে দায়দায়িত্বও। কারণ ভিনদেশের মানুষ এ বছর একুশে ফেব্রুয়ারি যখন প্রথম বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস পালন করা শুরু করেছে, তখন থেকেই নিশ্চয়ই একটু না একটু কৌতূহল তাদের হবেই, তারা জানতে চাইবে কেমন করে একুশে ফেব্রুয়ারি বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস হলো? এ প্রশ্নের সহজ উত্তর যদিবা দেয়া যায় এই বলে যে, "বাঙালী তাদের মাতৃভাষা বাংলার অধিকার অর্জন ও মর্যাদা রক্ষার জন্য আন্দোলন করেছিল এবং ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি শহীদ হয়েছিলেন বেশ ক'জন বাঙালী যুবক, তাঁদের স্মরণে বাংলাদেশে পালিত হয় শহীদ দিবস; এখন সেই দিনটি হয়েছে বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস।"

এ উত্তর কিন্তু আরও কিছু প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে— সেগুলো বাংলা ভাষা, বাংলাদেশ, বাঙালী জাতি সম্পর্কিত। দেশটাকে চেনা তেমন কঠিন নয়, বিশ্ব মানচিত্রে ক্ষুদ্র হলেও বঙ্গোপসাগরের তীরে বিশেষ রঙে আলাদা করা আছে দেশটি। কিন্তু ভাষা এবং ভাষাভিত্তিক যে জাতীয়তা বাঙালী লালন করে আসছে তার পরিচয় তুলে ধরাটা বেশ দুরূহই। কারণ এমন নয় যে, বিশ্ববাসীকে জানানোর মতো সমস্ত আয়োজন আমরা করে রেখেছি এখন সেগুলো ইন্টারনেটের মাধ্যমে পৌঁছে দিলেই হলো। এবার সামান্য কিছু তথ্য শুধু আমরা ইন্টারনেটে দিতে পারছি, কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। কারণ এ জাতি যতটা প্রাচীন, যতটা ঐতিহ্য বহন করছে এর সংস্কৃতি—ততটা তথ্য দেয়ার মতো সক্ষমতা আমরা অর্জন করিনি। এমনকি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী কোটি কোটি বাঙালীর কাছেও ভাষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতির বার্তা ঠিকমতো পৌঁছছে না। এমনকি পাশের দেশ ভারতের বাঙালী অধ্যুষিত রাজ্য পশ্চিম বাংলার বিদগ্ধ ব্যক্তিরাও ভাষা শহীদদের নামগুলো ঠিকমতো জানেন না। এর দায় কেবল তাঁদের ওপর চাপিয়ে দিলেই কিন্তু দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। কারণ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির এই যুগে আমরা যদি আমাদের তথ্যগুলো না জানাতে পারি, এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কী হতে পারে! তিন চার পুরুষ ধরে অনেক বাঙালী পরিবারই উত্তর আমেরিকা বা ইউরোপে বসবাস

আবীর হাসান

করছে। এদেরও সচেতনতা নেই ভাষা এবং ইতিহাস ঐতিহ্য সম্পর্কে। অভিবাসীদের নতুন প্রজন্মের অনেকেরই ধারণা লাতিন আমেরিকা বা আফ্রিকার আদিবাসী উপজাতীয়দের মতো অবস্থা বাঙালী জাতির।

গত বছর দশেকে সমস্যা আরও বেড়েছে। কারণ পাশ্চাত্যে জ্ঞানের আধার এবং মাধ্যম হিসাবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকেই বিশেষভাবে মূল্যায়ন করা হচ্ছে। কিন্তু সেই চৌহদ্দিতে বাংলাদেশ, বাংলা ভাষা এবং সংস্কৃতি বিষয়ক তথ্য খুবই কম।

আসলে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে তথ্য প্রযুক্তির উপযোগী করাটা এখন খুবই জরুরী হয়ে পড়েছে। শুধু বিদেশী বা বিদেশে অবস্থানকারী বাঙালীদের জন্যই নয় দেশের নতুন প্রজন্ম—যারা তথ্য প্রযুক্তিকে অবলম্বন করে শিক্ষিত হয়ে উঠছে তাদের জন্যও প্রয়োজন হবে ভাষা-সংস্কৃতির তথ্য প্রযুক্তি উপযোগী হওয়াটা।

তথ্য প্রযুক্তির মূল্যায়নটা এখন অন্যভাবেও করতে হচ্ছে। কেননা কম্পিউটারভিত্তিক তথ্য প্রযুক্তি এখন শুধু ব্যবসাবাণিজ্য অর্থনীতির নিয়ামকই হয়ে ওঠেনি, জ্ঞানের উৎস ও বাহনেও পরিণত হয়েছে। সব রকমের মানবীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে এর আওতা যেহেতু ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে সেহেতু এর বাইরে থাকায় অর্থ সভ্যতার গণ্ডি থেকে ছিটকে পড়া।

বিষয়টিকে মেনে নেয়া সহজ হবে এভাবে চিন্তা করলে— ছাপাখানার আবিষ্কারের পর থেকে যেমন গ্রন্থই জ্ঞানের বাহনে পরিণত হয়েছিল তেমনি এখন আবার কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি জ্ঞানের বাহনে পরিণত হয়েছে। কাজেই এত দিন পর্যন্ত যেমন বিভিন্ন ভাষায় নানা বিষয়ের গ্রন্থ প্রকাশ ছিল গুরুত্বপূর্ণ, এখন তেমনি তথ্য প্রযুক্তিতে বিভিন্ন ভাষার ব্যবহারও হয়ে উঠেছে গুরুত্বপূর্ণ। একটি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী জাতির ভাষা হিসাবে বাংলাকেও তথ্য প্রযুক্তির উপযোগী করাটা এখন খুবই জরুরী হয়ে পড়েছে। কিন্তু কাজটি তেমন এগোয়নি।

গ্রন্থ প্রকাশনা ও নানা ধরনের ছাপার কাজের জন্য বিভিন্ন সময়ে টাইপ ফাউন্ড্রি থেকে শুরু করে, টাইপ রাইটার লাইনো কম্পোজ, ফটো কম্পোজ ইত্যাদিতে বাংলা ভাষার ব্যবহারকে প্রযুক্ত করতে হয়েছে প্রয়োজনের তাগিদেই। একই প্রয়োজনে কম্পিউটারের মাধ্যমে বাংলা টাইপ কম্পোজও চালু হয়েছে। আমাদের প্রকাশনা শিল্পে কম্পিউটারে বাংলা বর্ণ কম্পোজ বেশ ভাল পরিবর্তনই এনেছে। কিন্তু যতটুকু হয়েছে ততটুকুতে সন্তুষ্ট থাকা যাচ্ছে না। কারণ তথ্য প্রযুক্তিতে ভাষা ব্যবহারের বিষয়টি কেবল প্রকাশনা শিল্প সম্পর্কিত নয়। এর সঙ্গে অন্যান্য কাজের বা কম্পিউটিংয়ের ব্যাপক পরিসরের কাজকর্মও জড়িত। এ জন্যই প্রয়োজন বাংলা ভাষাকে তথ্য প্রযুক্তি উপযোগী করে তোলা। এ প্রয়োজনটা অনেক আগেই অনুভূত হয়েছিল, তখনও ইন্টারনেট এত সম্ভাব[…] দেখায়নি তবে কম্পিউটারের কদর এদেশে বাড়ছিল। সেই ১৯৮৭ সালেই গঠিত হয়েছিল কম্পিউটারে বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কমিটি। কিন্তু কমিটি গঠন হলেও দীর্ঘদিন কমিটি কোন সিদ্ধান্ত নিতেও পারেনি, দিতেও পারেনি। বরং হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারে বাংলা ভাষার বাস্তবায়ন বিষয়টি আমলা ও ব্যবসায়ীদের বিরোধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ ছাড়া বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব সমস্যা সৃষ্টি করে। সমন্বয়হীনতা এবং বিরোধের প্রধান কারণ ছিল প্রধানত ব্যবসায়িক স্বার্থ এবং কম্পিউটার বিষয়ক সচেতনতার অভাব। অনেক বিতর্ক ও তোলপাড়ের পর ১৯৯৩ সালের জুন মাসে কম্পিউটারে বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কমিটির সভায় অনুমোদিতও হয় কম্পিউটারে বাংলা কী বোর্ড লে আউট এবং বাংলা প্রমিত তথ্য বিনিময় কোড। একে অভিহিত করা হয় বিএসসি আইআই বা বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড কোড ফর

আন্দোলনের উত্তাল দিনগুলিতে শহীদ মিনারে সংগ্রামী জন[…]
—ছবি :[…]

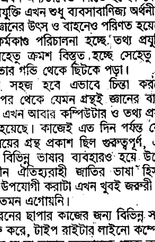

ইনফরমেশন ইন্টারচেঞ্জ।

আসলে কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা প্রযুক্ত করার বিষয়টি টাইপ সেট তৈরি বা টাইপ রাইটারের বাংলা কী বোর্ড তৈরির মতো যান্ত্রিক পদ্ধতি নয়। এতে গাণিতিক সাঙ্কেতিকরণ পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয়। তদুপরি কম্পিউটারে শুধু বাংলা বর্ণ টাইপ করতে পারলেই হয় না বাংলায় কমান্ড বা নির্দেশ যাতে পায় তার ব্যবস্থা করতে পরিহার্য হচ্ছে কম্পিউটারে বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন। কিন্তু ১৯৮৭ সালে এ সম্পর্কিত কমিটি গঠিত হলেও শুধু মাত্র কী বোর্ডের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতেই সময় লেগে যায় বছর ছ'য়েক। এর পরেও জটিলতা শেষ হয়নি। ১৯৯৩ সালের জুলাই মাসে BCII অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয় বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে। বিসিসির দ্বাদশ কাউন্সিল সভায় অনুমোদনের পর এটি হস্তান্তর করা হয় বিএসটিআই-এর কাছে। কিন্তু পরের মাসে বিএসটিআই ওটা নাকচ করে দেয়। অভিযোগ আছে কিছু ব্যক্তির আপত্তির মুখেই বিএসটিআই কর্তৃপক্ষ প্রথম বাংলা প্রমিত তথ্য বিনিময় কোড বাতিল করে দেয়। আবার আর একটি কমিটি গঠন করা হয়। এরপর বিএসটিআই দায়িত্ব দেয় বিসিসিকে। ১৯৯৫ সালে তৈরি করা হয় BDS : 1520 নামের বাংলা কোডেড ক্যারেক্টর সেট।

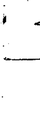

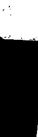

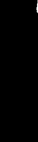

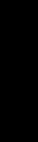

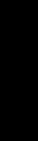

ইতোমধ্যে কিন্তু ১৯৯১ সালের জানুয়ারি মাসেই গঠিত হয়েছিল বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাকে কম্পিউটার উপযোগী করার জন্য জেনেভাভিত্তিক সংস্থা ইউনি কোড কনসোর্টিয়াম। এই কনসোর্টিয়াম প্রাথমিকভাবে ১৫ বিটভিত্তিক কোডিং পদ্ধতি ও ইউনি কোড স্ট্যান্ডার্ড ভার্সান ২.০-তে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার ৬৫ হাজার ৫শ' ৩৬টি বর্ণ অন্তর্ভুক্ত করে।

১৯৯৩ সালে যখন বাংলাদেশে কী বোর্ড অনুমোদন নিয়ে সিদ্ধান্তহীনতা চরমে তখন ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ড অর্গানাইজেশন (ISO) এবং ইন্টারন্যাশনাল ইলেক্ট্রোটেকনিকাল কমিশন (IEC) মিলে ৩২বিট (৪ বাইট) ভিত্তিক কোডিং সিস্টেমের মাধ্যমে ISO/IEC/10646-1:1993 নামের একটি ISO স্ট্যান্ডার্ড বলবত করে। এতে বিশ্বের ৬৪টি ভাষার অক্ষর বা ক্যারেক্টর সেট অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর মধ্যে 'বেঙ্গলি কোডেড ক্যারেক্টর সেট'ও ছিল কিন্তু তাতে বাংলাদেশের বাংলার সঙ্গে কিছু অমিল ছিল। এর কারণ ভারত পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলো অর্থাৎ উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, মনিপুর, মিজোরাম, ইত্যাদিতে প্রচলিত লেখ্য ভাষার অক্ষরগুলোকে মিলিয়ে একটি কোডেড ক্যারেক্টর সেট অনুমোদন করিয়ে নেয়। ঐ সময়ে অবশ্য আইএসও থেকে বাংলাদেশের বিএসটিআইকে জানানো হয়েছিল ভারতীয়দের বেঙ্গলি কোড ক্যারেক্টর অনুমোদনের বিষয়টি। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে বিএসটিআই কর্তৃপক্ষ কোন উদ্যোগই নেয়নি। এমন অভিযোগও আছে যে, বিএসটিআই কর্তৃপক্ষ চিঠির বিষয়বস্তু তখন বুঝে উঠতে পারেনি। সম্ভবত এ অভিযোগ ক্ষুব্ধ তারুণ্যের প্রতিক্রিয়া, তবে এ কথা সত্য যে, বিএসটিআই ততদিন পর্যন্ত উদ্যোগ নেয়নি যত দিন পর্যন্ত না কানাডা থেকে বাহরাইনের বাংলাদেশ দূতাবাস সেখান থেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ঘুরে বিসিসিতে পৌঁছায়। এর পরই কাজ একটু একটু করে এগোতে থাকে।

[…]তার সমাবেশ — আমানুল হক

বিসিসি বিএসটিআই ১৯৯৫ সালে ২২৪টি প্রতীক সংবলিত BDS 1520 : 1995 বাংলা কোডেড ক্যারেক্টরে তৈরির অনেক পরে ১৯৯৮ সালের অক্টোবর মাসে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ইউনিকোডের জন্য বাংলা ক্যারেক্টর কোড সেট প্রণয়নের উদ্দেশ্যে বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালককে আহ্বায়ক করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। ঐ ১৯৯৮ সালের অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহেই BDS 1520 : 1995 ইউনিকোড এবং ISO/IEC 10646-1। পর্যালোচনা করে একটি বাংলা কোড সেট-এর সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে কমিটি একজন ফেলো নিয়োগের ব্যবস্থা করে।

এর মধ্যে আবার ইউনিকোড জানিয়ে দেয়, বাংলাদেশের বাংলাভাষার জন্য আলাদা ক্যারেক্টরের অনুমোদন দেবে না। কারণ হিসাবে বলা হয়, একই ধরনের ক্যারেক্টরের জন্য ইউনিকোড কর্তৃপক্ষ দু'টি কোড বরাদ্দ করতে পারে না। এই চিঠি পাওয়ার পর বিএসটিআই কর্তৃপক্ষও চিঠি লেখালিখি শুরু করে। এক পর্যায়ে আইএসও'র টোকিও অফিস থেকে জানানো হয়, বাংলাদেশ যেহেতু স্বাধীন রাষ্ট্র সেহেতু অন্য কোন দেশের রাজ্যের চেয়ে এর দাবিকে অগ্রাধিকার দেবে, তবে সেক্ষেত্রে নতুন কোড বরাদ্দ না নিয়ে যদি কোন শক্তিশালী কমিটির মাধ্যমে ইউনিকোডে অন্তর্ভুক্ত বেঙ্গলি কোডেড ক্যারেক্টরের যৌক্তিক রদবদলের সুপারিশ করে তাহলে তা অনুমোদিত হতে পারে। সেই কাজটি করার জন্যই আসলে বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালককে আহ্বায়ক করে কমিটি গঠন করা হয়েছিল এবং কমিটি এ জন্য ফেলো নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। ফেলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক সাইফুদ্দিন মোহাম্মদ তারিক কিন্তু নিয়োগ পান ১৯৯৯ সালের ২৫ মার্চ। তিন মাস পর তিনি রিপোর্ট পেশ করলেও তা চূড়ান্ত করে ইউনিকোডে পাঠাতে অনেক সময় লেগে যায়।

ফেলোর সুপারিশ এবং কমিটি সদস্যদের সিদ্ধান্ত হয়েছে ইউনিকোডের ISO/IEC 10646-1-এ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয় না এমন অনেক বর্ণ থাকলেও কেবল "ৎ" বর্ণটিকে সংযোজন করতে পারলে এটা বাংলাদেশের বাংলা ভাষায় ব্যবহারোপযোগী হবে। বাংলা একাডেমীর সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র থেকে জানা গেছে, এগুলো আসলে ঠিক অপ্রয়োজনীয় বর্ণ নয়। কারণ বাংলা ভাষায় এক সময়ে এ ধরনের বর্ণ ছিল। ফলে গবেষণার কাজে এগুলো লাগে। তবে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলছেন বেঙ্গলি কোডে বাংলা ভাষার বর্ণের সঙ্গে অহমিয়া ও উড়িয়া বর্ণ থাকায় এটাকে ঠিক বাংলাদেশের বাংলা ভাষার কোড বলা যাবে কিনা! এ ছাড়া বেঙ্গলি নামকরণ নিয়েও খুঁতখুঁতানি আছে কারুর কারুর। অবশ্য প্রযুক্তি অভিজ্ঞ যুক্তিবাদীদের বক্তব্য হচ্ছে, ৎটি যোগ করে দিলেই যেখানে কাজ চলে যায় এবং যেহেতু স্বাধীন দেশ হিসাবে আইএসও বাংলাদেশকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে, সেহেতু নামকরণেও "বাংলা ক্যারেক্টর কোড সেট" হিসাবে একে অভিহিত করা তেমন সমস্যা হবে না।

ইউনিকোডে বাংলা ক্যারেক্টর অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি কিন্তু এখন পর্যন্ত নিশ্চিত হয়নি। গত ১৭ জানুয়ারি বাংলা ক্যারেক্টর সেট কমিটি চূড়ান্ত রিপোর্ট অনুমোদন করেছে। বাংলা একাডেমীর সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে এত দিনে আইএসও-তে পাঠানোর কথা কিন্তু তার আগে কিছু করণীয় ছিল। যেমন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠকে অনুমোদনের জন্য পেশ। অনুমোদনের পর বিএসটিআই হয়ে আইএসও-তে প্রেরণ। এইএসও'র অনুমোদনের পর কোডটি বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের উপযোগী হবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত নিশ্চিত নয় কোডটির ভাগ্যে কি ঘটেছে। তবে কিছু দেরিতে হলেও আইএসও'র অনুমোদন পেলে বাণিজ্যিকভাবে এটি ব্যবহার করা সম্ভব হবে। প্রথম কাজ হবে একটি সর্বজনগ্রাহ্য বাংলা কী বোর্ড তৈরি ও তা বাজারজাত করা। কারণ এখন বেশ কয়েক ধরনের কী বোর্ড বাজারে রয়েছে, যে কারণে ব্যবহারকারীদের সমস্যা হচ্ছে। একটি কী বোর্ডে প্রশিক্ষণ নিয়ে সব কী বোর্ডে কাজ করা সম্ভব নয়। এ জন্য সরকারই যদি প্রমিত বাংলা কী বোর্ড তৈরি করে এজেন্টের মাধ্যমে বাজারজাত করার ব্যবস্থা করে তাহলেই সম্ভবত অনেক ঝামেলা থেকে ব্যবহারকারীরা মুক্ত হতে পারে।

এর পাশাপাশি ইউনিকোডকে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের কাজে লাগাতে হলে অবশ্যই এ্যাপেল, মাইক্রোসফট এবং লিনাক্স (রেড হ্যাট)-এর সহযোগিতা পেতে হবে। যতদূর জানা গেছে, মাইক্রোসফট অচিরে তাদের উইন্ডোজের উপযোগী করবে বাংলা ইউনিকোডকে। এটা এখনও সম্ভাবনার পর্যায়েই রয়েছে, প্রতিশ্রুতি পর্যন্ত যায়নি। ইতোমধ্যে কিন্তু ডিজিটাল ট্রান্সলেশন এবং বহু ভাষা বোঝার উপযোগী কম্পিউটার ও ইন্টারনেট প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জোর চেষ্টা চলছে। অবশ্য কম্পিউটার ও সফটওয়্যার নির্মাতা এবং ইন্টারনেট ব্যবসায়ীরাই নিজেদের স্বার্থে চাচ্ছেন তথ্য প্রযুক্তিকে বহু ভাষার উপযোগী করে তুলতে। কারণ শুধু ইংরেজী ভাষাভিত্তিক হয়ে থাকলে যে তাদের ব্যবসাটাও সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে কিংবা ধীর গতিতে হবে প্রবৃদ্ধি —এটা তারা ভাল মতোই বুঝেছে। জ্ঞান বা সাধারণ কাজেকর্মে সবকিছুই সব দেশের জনসাধারণ চায় মাতৃভাষাতেই সারতে। সে কারণেই এখন বিশ্বের বৃহত্তম চিপ নির্মাতা ইন্টেল, সফটওয়্যার নির্মাতা মাইক্রো সফট, কম্পিউটারের সুপ্রাচীন প্রতিষ্ঠান আইবিএম, সিলিপস সিমেন্স ইত্যাদি ইলেক্ট্রনিক কোম্পানিও বিভিন্ন ভাষা বোঝার কম্পিউটার তৈরি গবেষণায় অর্থায়ন করছে। এই সব গবেষণায় কিন্তু বাংলা ভাষা নেই। এখন থেকে চেষ্টা করলেও হয়ত বাংলাকে বহুভাষী কম্পিউটার পদ্ধতিতে সমন্বিত করা যাবে।

আমরা যখন প্রথমত বাংলা কী বোর্ড তৈরির কাজ করছি, তখন কিন্তু কী বোর্ডহীন কম্পিউটার তৈরির গবেষণাও অনেক দূর এগিয়ে গেছে। কী বোর্ডবিহীন কম্পিউটার অর্থাৎ মুখের কথায় চলা কম্পিউটার। এর জন্য প্রধান গবেষণাটা করছে লক আউট এ্যান্ড হসপাই আর এর জন্য ইন্টেল, মাইক্রো সফট, আইবিএম সবাই অর্থ দিচ্ছে। ইন্টারনেটে বহু ভাষা ব্যবহারের জন্য জার্মানির হাইডেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি গবেষণা চলছে। এ ধরনের গবেষণার সঙ্গেও আমাদের যুক্ত হওয়া দরকার। নিজেরা গবেষণা করতে না পারি মাইক্রো সফট, আইবিএম ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে নিজেদের ভাষাকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

এখানে এখন ভাষাকে প্রযুক্তি উপযোগী করার দায়িত্বটা কে নেবে তাই নিয়েও একটা রহস্যময় পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। বাংলা একাডেমী বলছে তাদের প্রযুক্তি গবেষণার মতো লোকবল তো নেই। নেই বলে করা যাবে না এমন কোন বিধিবদ্ধতা কি আছে! এ জন্য অবশ্য বিজ্ঞান প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত উদ্যোগ নেয়া জরুরী। বাংলা একাডেমীর আওতায় কিংবা এর বাইরেও একটি ভাষা প্রযুক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান খোলা প্রয়োজন। তবে বাংলা একাডেমীর আওতায় প্রতিষ্ঠানটি থাকলে ভাষা ও সংস্কৃতির মান রক্ষা করে অনেক কিছু করা সম্ভব। আপাতত জাতীয় কী বোর্ডের দায়িত্ব দিয়ে শুরু করা যেতে পারে। এ ছাড়া জানা গেছে, সিডিতে অভিধান বের করছে বাংলা একাডেমী। সবচেয়ে ভাল হয় এখনই ইন্টারনেটে যদি বাংলা বইয়ের একটি অনলাইন দোকান খোলা হয়। দেশ বিদেশের গ্রাহকদের কাছ থেকে ইন্টারনেটে অর্ডার গ্রহণ এবং ডাকযোগে বই প্রেরণ করে বাণিজ্যটা চালাতে পারলে বিদেশে অবস্থানরত বাঙালীরা সহজেই বাংলা বই কিনতে পারবে।

বাংলা ভাষাভিত্তিক সফটওয়্যার গবেষণা প্রতিষ্ঠানটিও বাংলা একাডেমীর অধীনে থাকাই বাঞ্ছনীয়। কারণ সফটওয়্যার রফতানির সম্ভাবনাও কম নেই। সেক্ষেত্রে দেশের সুনাম বিভিন্ন মহলের সঙ্গে যোগাযোগ ইত্যাদি নিয়মনিষ্ঠভাবে করার মতো সরকারী প্রতিষ্ঠান এই একটিই আছে। এ ধরনের উদ্যোগ নিলে হয়ত বাংলা একাডেমীর সম্প্রসারণ এবং এর কিছু কিছু বিভাগকে ঢেলে সাজানোর প্রয়োজন হবে। সভ্যতা বদলের প্রযুক্তির সঙ্গে তাল রেখে ভাষা ও সংস্কৃতিকে আধুনিক এবং যুগোপযোগী করতে হলে তো এ কাজ করতেই হবে। সিদ্ধান্তটা এখনই নেয়া প্রয়োজন না হলে আমাদের পিছিয়ে পড়তে হবে। সংশ্লিষ্ট সকলকে এ কথাটা মনে রাখতে হবে। বাংলা ভাষার প্রযুক্তি উপযোগী হয়ে ওঠার ওপর নির্ভর করছে জাতীয় সম্মানের অনেকটাই। মাতৃভাষায় তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ পেলে এদেশের প্রচুর মানুষেরই জীবনমানের আসবে পরিবর্তন। ভাষা যেমন বাঙালীকে স্বাধীনতা অর্জনের শক্তি যুগিয়েছে, এক দিন হয়ত তেমনি অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনেরও উপলক্ষ হয়ে উঠবে।